দৈনিক জনকণ্ঠ

৪৭

তারিখ SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রশাসনিক সংস্কার অপরিহার্য

দুঃখজনক হলেও এটা নির্মম সত্য যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চা খুব বেশিদিনের নয়। সেই সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই দেশটি খুব অল্পসময়ই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আওতায় থাকতে পেরেছে। বারংবার সামরিক শাসন, স্বৈরাচারী শাসন, এমনকি গণতন্ত্রের লেবেল এঁটেও প্রশাসনকে অতীতের কর্মবিমুখতা, ঘুষ-দুর্নীতির জটাজাল থেকে মুক্ত করা যায়নি। কিন্তু আজ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সচল থাকায় প্রশাসনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ্যে আলোচিত হচ্ছে। এতে মানুষ দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে। বিগত এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে বহু আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ হয়েছে যতটুকু তা খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। গত বৃহস্পতিবার 'জনপ্রশাসনে দুর্নীতি' শীর্ষক সেমিনারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' নামক প্রতিষ্ঠান এই সেমিনারের আয়োজন করে। একথা সবাই জানে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে প্রশাসন, আইন-প্রণয়ন শাখা, বিচার বিভাগ এবং ওয়াচডগ হিসাবে চতুর্থ স্তম্ভ তথা স্বাধীন সংবাদপত্র।

প্রধানত, প্রথম তিনটি স্তম্ভের পারস্পরিক সহযোগিতায় সরকারের কার্যকলাপ পরিচালিত হওয়ার কথা। সর্বোপরি, স্বাধীন সংবাদপত্র তো সরকারী কার্যকলাপের ভাল-মন্দ, ত্রুটি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে সত্যের পথে চলার জন্য পথপ্রদর্শন করে। আমাদের প্রশাসনিক কাঠামোটি তো ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ শাসন আমলের মডেলে তৈরি। পাকিস্তান আমলেও কমবেশি একই ধারায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট করে বিধৃত করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার পর এই সংবিধানকে গণমুখী করার প্রক্রিয়াটি হোঁচট খায়। ফলে, পাকিস্তানী আমলের মতোই আমলাতন্ত্র দেশের ওপর জেঁকে বসে। সেমিনারে উদ্বোধনী ভাষণে প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল বলেন, 'আগে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' ছিল রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এখন রাষ্ট্র 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন' করছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্র যদি দুর্নীতির সংস্কৃতি লালন করে তবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আমরা কিভাবে আশা করি? বস্তুত, সেমিনারে দুর্নীতির জন্য কে বেশি দোষী তা নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিবিদ ও আমলারা। সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, আমলাদের সই ছাড়া কোন লেনদেন হয়না, তাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজনীতিবিদদের পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরে ৯০ শতাংশ দুর্নীতির জন্য ব্যাংকাররাই দোষী। অপরদিকে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সরকারী কর্মকর্তা, দাতা সংস্থা ও অন্য আলোচকরা বলেছেন, দুর্নীতি দমনের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার (কমিটমেন্ট) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কামাল হোসেন বলেন, দুর্নীতি কি ও কেন তা ডায়াগনোসিস করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন জবাবদিহিতাকে মন্ত্রের মতো কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা। দুর্নীতি দমনে রেমিডিয়াল ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ভারতে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) ওপরে সুপ্রীম কোর্ট নজরদারি করে। কেউ যে আইনের উর্ধে নয় তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশেও সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকা নেয়া উচিত। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, যেকোন দুর্নীতিরোধের জন্য প্রয়োজন স্বার্থসংশ্লিষ্টদের পাহারাদারি। যেহেতু রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্ন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সেজন্য রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা মিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ কপিল কাপুর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলেন, যেসব দেশে দুর্নীতি দমনে সাফল্য এসেছে তাঁর প্রত্যেকটিতেই রাজনীতিবিদদের ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সেমিনারে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, "মন্ত্রী হওয়ার পর খুব অসুবিধায় আছি। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে ছেলেরা এসে আমাকে ধরে, বলে আপা, পিএসসিতে একটু বলে দেন। আমি বিস্মিত হয়ে বলি, কিভাবে বলব, বিসিএস পরীক্ষায় তো তদ্বির চলেনা। তরুণরা তখন নানান উদাহরণ দেখায়, বলে অমুক মন্ত্রীর কথায় অমুকের চাকরি হয়েছে। এমনভাবে তারা বলে যে, বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। আমি তরুণদের সামনে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করি।" খাদ্যমন্ত্রীর এই উক্তি নিদারুণ বেদনার। এক ক্ষমতাধর অথচ অসহায় ব্যক্তির আক্ষেপের মতো শোনায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, দুর্নীতি আজ কিভাবে আমাদের সমাজের রন্ধ্রেরন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

দুর্নীতির বিষবৃক্ষকে উৎপাটন না-করতে পারলে দেশের প্রশাসন সচল হবেনা।